NANDAN

XXX 2011

SPECIAL ISSUE

150 YEARS BIRTH ANNIVERSARY OF RABINDRANATH TAGORE

DEPARTMENT OF HISTORY OF ART
KALA BHAVANA

রবীন্দ্রনাথ : একশো পঞ্চাশ

পুলক দত্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের একটি রিপোর্ট'।

> সার্ধশতবর্ষ। মানেই একটা ফিক্সড ক্যাপিটাল। যে যেমন ইচ্ছে ভাঙাও। যদিও এখন খোলা বাজার। উদার অর্থনীতি। এখন আর কেউ ওঁকে বুর্জোয়া বলে না। একটা মানুষ মৃত্যুর এত বছর পরেও মার্কেট ভ্যালু বাড়িয়ে চলেছেন! এ যেন কাপড় ধোয়ার ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপন। যত ধোয়া যাবে ততই উজ্জ্বলতা বাড়ে। আর তাই যে যার মতো চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য অনেকের মতো মহেশতলা পুরসভাও উদ্যোগ নিয়েছে। কাট আউট, ব্যানার। ২১শে মে উৎপল দত্ত মঞ্চ। বিশ্বভারতী ও বীরভূম থেকে শিল্পীরা এসেছেন।...[১]

একশো-পঞ্চাশ-রবীন্দ্রনাথ। ... উদয়নের বারান্দা, দুদিকে দুটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত চেয়ার। বারান্দার একদিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত একটি পিয়ানো, অন্যদিকে আরেকটি পিয়ানো। প্রথম পর্ব : কিছু রবীন্দ্ররচনা পাঠ, বক্তৃতা, বিশ্বভারতী প্রকাশিত নতুন বইয়ের প্রকাশ। দ্বিতীয় পর্ব : পিয়ানো সহযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন। পঁচিশে বৈশাখ, ১৪১৮, শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ-পঞ্চাশ-পঞ্চাশ, আরো পঞ্চাশ। ... ধরা যাক, ট্রেনে চড়ে হাওড়া স্টেশনে নামলাম, ট্যাক্সি নিয়ে গড়িয়াহাটের পথে। কিছুক্ষণ পর একটা সিগনালের কাছাকাছি আসায় হাল্কা গান ভেসে আসছে, *আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি* ... ট্যাক্সি এসে সিগনালে দাঁড়ালো, গানের আওয়াজ বাড়ল, *কেবল শুনি, কেবল শুনি, কেবল শুনি, তুমি কেমন করে গান কর হে গু*। লাল থেকে সবুজ আলো, একটি রঙের 'পরিবর্তন', হঠাৎ গান বন্ধ। ভোঁ-ভোঁ, প্যাঁ-পুঁ, একসঙ্গে এতগুলো গাড়ির হর্ন। রবীন্দ্রনাথ আর একশো আর পঞ্চাশ...

সত্ত্বাদর্শন

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সকল মানুষের মনেই কিছু বিশ্বাসের জন্ম হয়। সমাজে, সংসারে আমাদের আচরণ পরিচালিত হয় এই বিশ্বাস থেকে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমাদের মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, নিজের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। এই বিশ্বাস আমাদের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রভাবে নানান

---

[১] একলব্য, 'রেডিমেড রবীন্দ্র-সার্ধশতবর্ষ পালন মহেশতলা পুরসভায়', *খবরের কাগজ, সংবাদ মন্থন*। ৫ জুন, ২০১১।

প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতে বিবর্তিত হয়। জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই মানুষের মনে উঠে আসে কিছু গভীর ও জটিল প্রশ্ন - সৃষ্টির আদি, প্রকৃতির স্বরূপ, চৈতন্য ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রেই তার উত্তর মেলে না, তবু প্রশ্ন উঠে আসাটাই মুখ্য।

দার্শনিকেরা বলেন দর্শনশাস্ত্রের একটি মৌলিক প্রশ্ন সত্তাকে ঘিরে। সত্তা কি চৈতন্য নির্ভর, নাকি চৈতন্য-নিরপেক্ষ কিছু। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই দার্শনিকেরা নানান সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। রবীন্দ্রদর্শনের ভিত্তি এই দুটির সমন্বয় চিন্তায়, সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায়। শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই দার্শনিক অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার দুটি পূর্বস্বীকৃত বিশ্বাস হল,

> (ক) নাস্তিত্ব বা মৃত্যু (খ) মানবেকেন্দ্রিকতা।... যে কোনও চিন্তাধারায় যেমন কিছু প্রাথমিক সত্য মেনে নিয়ে সুরু করা হয় সেইরূপ রবীন্দ্রনাথ উপরে উল্লিখিত দুটি বিশ্বাস নিয়ে তাঁর দার্শনিক চিন্তা - কি কাব্যে, কি জীবনে - প্রকাশ করলেন।
>
> এক পরম শূন্যতার অনুভব যা ভয়াবহ মনে হতে পারে অথচ যা অনিবার্য তাকে অস্তিত্বের ধারায় সার্থকতা দেওয়া বা মৃত্যুকে অমৃতের রূপে সাজানো যেমন কবিকে অত্যাধুনিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের মূল বক্তব্যের কাছাকাছি নিয়ে এল, তেমনই আবার ঔপনিষদিক অমৃত-চেতনা তাঁকে মৃত্যুর বিভ্রম, নাস্তিত্বের বা শূন্যতার সংহারী-রূপ অতিক্রম করতে সাহায্য করল। বৈপরিত্য সংযোগে এই নাস্তিত্ব বা বিধ্বংস গভীর সত্তার অনুভবে নিয়ে গেল তাঁর দর্শন; অর্থাৎ না থাকার হাহাকার অনন্ত সত্তায় হল বাধিত। ফলে 'থাকাটা' হল পরম প্রশ্ন। তদুপরি 'মানবিকতা বোধ' এই 'থাকা' ক্রিয়ায় কর্তার সার্থকতা প্রদান করল, ফলে মূল স্বীকৃতি হল "আমি আছি"। এই "আমি আছি"-র বিস্ময়ই হোক, বা রহস্যই হোক, রচনা করল রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার সুস্পষ্ট পটভূমি।[২]

এই ধরনের সিদ্ধান্ত অথবা দার্শনিক অবস্থান সব দার্শনিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। মানবিকতাকে বা 'আমি'-কে বা চৈতন্যকেই সত্য বা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়ার অধিকার নিয়েই উঠতে পারে প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের অবস্থান যদিও এ-ক্ষেত্রে খুব পরিষ্কার। রবীন্দ্রনাথের এই 'আমি'-কে 'অহং' বলে ধরে নিলে ভুল করব। 'রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ মাত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয় - 'অহং'-এর বিশিষ্ট নামরূপধারী প্রতিভূ নয় - স্বয়ম্ভূও নয়। মানবেতর বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় ঐক্য সাধনেই মানবের স্বকীয়তা - তার সার্থকতা ... চৈতন্য-নিরপেক্ষ প্রকাশ নেই; প্রকাশ-নিরপেক্ষ সত্তা নেই। অতএব সত্য ও চৈতন্য পৃথক নয়।... এ মানবিকতা তাই... 'অহং-হীন', নিরাসক্ত, তত্রাচ সৃজনশীল মানবিকতা।'[৩]

এই বিশ্বমানবের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন, ব্যক্তি আমি অথবা 'অহং'-এর থেকে মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন। এই দর্শনই তাঁর কাব্যে গানে প্রবন্ধে চিঠি-পত্রে জীবনে প্রকাশিত। এই আত্মীয়তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে করে তোলে সুন্দর। তারই আয়োজন দেখি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায়, গ্রাম পুর্নগঠনের কাজে। রবীন্দ্রনাথের জীবন আর কাজ এই ব্যক্তি আমি থেকে মুক্ত হবারই চর্চা - 'একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে, একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে'-র আমি থেকে 'মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি, শান্ত আমি, দীপ্ত আমি'-র দিকে যাত্রা।[৪]

---

[২] শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রদর্শন*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৭৫। পৃ.১১

[৩] শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রদর্শন*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৭৫। পৃ.১২

এই আত্মীয়তা সহজলভ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের মধ্যেই এই লড়াইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, '...আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। ... কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা... 'ডাকঘরে'... প্রকাশ করলুম। ... আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল।'[৫] ১৯১৪ সালে, "সীমা শব্দটার সঙ্গে একটা 'না' লাগিয়ে দিয়ে আমরা 'অসীম' শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি। কিন্তু অসীম তো ' না' নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন 'হাঁ'।... আমাদের প্রাণ তার প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে; মৃত্যুর 'না' দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্ছে 'হাঁ'।" সেই একই রবীন্দ্রনাথ সেই একই সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখছেন, 'দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মারবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবেনা, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ; অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা। ... আমি deliberately suicide করতেই বসেছিলুম - জীবনে আমার লেশমাত্র তৃপ্তি ছিল না।' এই চিঠি রবীন্দ্রনাথ শেষ করেছেন এই বলে, '...মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আসব কোনো সন্দেহ নেই।'[৭] রবীন্দ্রনাথ যে আবার 'আলোকে' উঠে এসেছিলেন, একথা আমদের জানা।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ, একশো, একশো পঁচিশ কি একশো পঞ্চাশ - কোন রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করব আমরা? কাকে আহ্বান করব আমাদের জীবনে? রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত চেয়ার বা পিয়ানো তো ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকেই বড় করে দেখায়। আড়াল করে রাখে 'মুক্ত, আমি, তৃপ্ত আমি, শান্ত আমি, দীপ্ত আমি'-র সাধককে।

দুই

আমাদের এক বন্ধুর মাসি এক সন্ধ্যায় তাঁর স্বামীকে বললেন, 'চলো, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে, একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।' তার উত্তরে মেসো নাকি বলেছিলেন, 'চাঁদ উঠেছে নিজের নিয়মে, তাই বলে আমাদের মাঠে গিয়ে নানানাচি করতে হবে নাকি?'... কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসবের সকালে চায়ের দোকানে একজন মন্তব্য করলেন, একটা গাছের চারা পোঁতা হবে, তাই নিয়ে এত আদিখ্যেতা : শঙ্খধ্বণী রে, গান রে, মন্ত্রপাঠ রে, পাল্কি রে, এমনকি নাচও! কি দরকার এ-সবের ? ... কলাভবনের ক্যান্টিন বড় করার প্রয়োজন হল। সেই প্রয়োজনের গুঁতোয় কলাভবনের প্রাণকেন্দ্র চাতালকে পুবদিকে সরতে হল কয়েক ফুট। গ্রাফিক্স স্টুডিয়ো আর মাস্টারমশাই-এর স্টুডিয়ো-র সঙ্গে সচেতন ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করে নির্মিত চাতাল সঙ্গতি হারালো।

প্রয়োজন আর প্রয়োজনাতিরিক্ত-র বৈপরীত্যে জয় হল প্রয়োজনের। 'ছোটো আমি' আর 'বড় আমি'-কে ছুঁয়ে রইল না। একের সঙ্গে অন্যের স্বাভাবিক আত্মীয়তা হল ব্যহত।

---

[৪] শঙ্খ ঘোষ, 'আমি', *নির্মান আর সৃষ্টি*, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। শ্রাবণ, ১৩৮৯ দ্রষ্টব্য।
[৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্র, *শারদীয় দেশ*, ১৩৭৩।
[৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছোট ও বড়ো', *শান্তিনিকেতন*।
[৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র* ২, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯। পৃ. ২৭-৩২।
রণজিৎ গুহ, *কবির নাম ও সর্বনাম*, তালপাতা, কলকাতা, ২০০৯ দ্রষ্টব্য।

উদ্বৃত্ত

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের পটভূমিতে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সংক্রান্ত বেশ কিছু নতুন প্রশ্ন উঠে এসেছিল। উনবিংশ শতকের কলকাতায় বেশ কিছু বাঙালি মনিষী সে সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে ব্রতী হয়েছিলেন। একদিকে বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শন, এই সবের মধ্যে দিয়ে কিছু নির্দিষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার এক আয়োজন। 'দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বিজয় মুখোপাধ্যায় সেই জ্ঞানচর্চার ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক অবস্থান এই জ্ঞানচর্চার সম্প্রসারণ। এই প্রবন্ধ তিনি শেষ করেছেন রবীন্দ্র প্রসঙ্গ দিয়েই।

> আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার প্রধান দুটি ধারণা হল 'সামঞ্জস্য' এবং 'উদ্বৃত্ত'। ... এ দুটি ধারণাও দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের (ব্রহ্মে) বিশ্বাস করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতার বাইরে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তাই সংগতভাবে তিনি কান্টের মতো ঈশ্বরের ধারণা idea of reason বলেই মানলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবি রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে মানুষের সৃষ্টিশীল রূপটিই প্রাধান্য পেল। আর এই সৃষ্টির আধার হয়ে উঠল এক transcendental consciousness বা তূরীয় চৈতন্য। এই তূরীয় চৈতন্যকেই, দ্বিজেন্দ্রনাথ অনুসরণে তিনি বললেন উদ্বৃত্ত।[৮]

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের যাবতীয় সৃজনশীলতার একমাত্র উৎস এই প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত। সত্তা ও চৈতন্যর সঙ্গে যুক্ত হল সুন্দর - সত্য ও সুন্দর আর পৃথক রইল না। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে জ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা, উৎসব-অনুষ্ঠান, নাটক, গান, মেলা - এই সবেই এই সুন্দরের প্রকাশ। উদ্বৃত্তের উদ্দীপনা, স্পন্দনই মানুষকে যা হইনি তা হবার দিকে টেনে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এই হয়ে ওঠার বেদনা এবং হয়ে ওঠার সংকল্প কেবল মানুষের মধ্যেই আছে। 'মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে... কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ করতে হবে। ... কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে। না, তিনি বলেছেন, 'তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব, আর-সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গসৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে'।[৯] এই স্বর্গই হবে সুন্দর আর সত্যের প্রকাশ, মনুষ্যত্বের প্রকাশ।

পৃথিবীর সকল মানব সমাজে উদ্বৃত্তের এই খেলা লক্ষ করি আমরা। মানুষের বাড়ি, পোষাক, আসবাবপত্র, এ-সবই প্রয়োজন মিটিয়েও হয়ে উঠেছে সুন্দর। সংসারকেই যখন স্বর্গ করতে হয় তখন প্রয়োজন আর প্রয়োজনাতিরিক্ত-র মধ্যে বিরোধ মিটে যায়, স্থাপিত হয় প্রেমের সম্পর্ক। কাজ আর খেলা একাকার হয়ে যায়। আর তখনই বলতে পারি, 'তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই'। প্রাণ খুলে গাইতে পারি, 'খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল, খেলতে খেলতে ফল যে ফলে - খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।' আর এই দুয়ের বিরোধ যদি না মেটে, সংসারে থাকাই তখন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। প্রয়োজনাতিরিক্ত যদি প্রয়োজনকে অস্বীকার করে, অথবা প্রয়োজন অস্বীকার করে প্রয়োজনাতিরিক্তকে, একজন জয়ী হয় আর অন্যজন হয় পরাজিত, সে-ক্ষেত্রে বিদ্বেষের জগতেই পড়ে থাকতে হয় মানব সমাজকে।

---

[৮] বিজয় মুখোপাধ্যায়, 'দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ', *আকাদেমি পত্রিকা* ২২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৌষ ১৪১৩-জৈষ্ঠ্য ১৪১৪, কলকাতা।
[৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৃষ্টির অধিকার', *শান্তিনিকেতন*।

যে-মন প্রেমে বিশ্বাসী, যে-সমাজ মিলনে, আহ্বানে বিশ্বাসী সে-সমাজই 'গাছ পোঁতা'-কে বৃক্ষরোপণ উৎসবে রূপান্তরিত করতে পারে। সেই একই কারণে গীতবিতানে যে গান পড়ি এই ভাবে,

এ কি - । গ ভী র । বা ণী - । এ ল - । ঘ ন - । মে ঘে র। আ ড়া ল। ধ' রে -
স ক ল । আ কা শ । আ কু ল । ক' রে -

সেই গানই গাইবার সময় হয়ে যায়,

এ । কি - । - এ । কি - গ। ভী র বা । ণী - । - এ । কি - গ। ভী র বা। ণী - এ। ল - ঘ । ন - মে -
- র ঘ । ন - মে । ঘে র আ । ড়া ল ধ' । রে - স। ক ল আ । কা শ আ । কু ল ক' । রে - এ । কি

রবীন্দ্রনাথের একশো পঞ্চাশ জন্মদিনে সেই 'সকল আকাশ আকুল করা' বাণী কে নমস্কার।